চতুর্থ অধ্যায় (পর্ব-৩)

চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন!

বন্যা আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর

সাধারণত আমাদের এক জীবনকালের সীমিত সময়ের মধ্যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। এটা ঘটতে হাজার, লক্ষ বা কোটি বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো প্রকৃতিতে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব দ্রুতও ঘটে যেতে পারে এই বিবর্তন প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা একটু অবাকই হয়েছিলেন প্রথমে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন যে, বিবর্তন দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত, ধীরে বা অত্যন্ত ধীরে - সব ভাবেই ঘটতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডঃ রিচার্ড ডকিনসের সাম্প্রতিক মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্যঃ

"Evolution, for instance, normally takes too long to make an impact within a human lifespan....... The amazing thing is how alarmingly fast evolution can sometimes go, when conditions are right. Let's hope bird flu won't turn out to be an example."

বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ, সময় সীমা, প্রক্রিয়া, এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা কি বলছেন এবং কিভাবে আসলে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়ে এসেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইলো পরবর্তীতে 'প্রজাতির উদ্ভব' অধ্যায়ে। এ অধ্যায়টির উদ্দেশ্য ছিলো পাঠকের সামনে এ ধরণের কিছু উদাহরণের বর্ণনা তুলে ধরা। আগের লেখাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো বিবর্তনের উদাহরণ দেখেছি আমরা, এখন চলুন ম্যাক্রো বিবর্তনের কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উদ্ভিদের নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে অহরহ

আমাদের চোখের সামনে প্রাকৃতিকভাবে মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ঘটনাটা একটু বিরলই বটে। তবে এধরনের ঘটনা যে একেবারে ঘটেই না তাও নয়। বিজ্ঞানীরা গত একশো বছরে বেশ কিছু উদ্ভিদের মধ্যে এধরণের নতুন প্রজাতি তৈরির ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরনের আরও উন্নত ফলনশীল ধান, গম বা ভুট্টার প্রজাতি তৈরির ঘটনা তো হরহামেশা আমরা খবরের কাগজেই দেখতে পাই।

১৯১০-১৯৩০ এর মধ্যে আমেরিকার ওয়াশিংটন এবং আইডাহো স্টেটে স্যালসিফাই নামে অনেকটা মুলার মত দেখতে এক ধরণের খাদ্যযোগ্য মুলের গাছের তিনটি প্রজাতির (*Tragapogon dubius, Tragapogon pratensis, Tragapogon porrifolius*) চাষ শুরু করা হয়। এর আগে আমেরিকায় স্যালসিফাই এর কোন অস্তিত্বই ছিলোনা, এদেরকে ইউরোপ থেকে এনে প্রথমবারের মত এখানে বোনা হয় (১১)। ১৯৫০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা আবাক হয়ে দেখলেন, তিনটি তো নয়, পাঁচ ধরণের স্যালসিফাই দেখা যাচ্ছে মাঠে! তাহলে এই নতুন দু'ধরণের প্রজাতি এলো কোথা থেকে? এরা তো

ইউরোপ থেকে আনা প্রথম তিনটি প্রজাতির সাথেও প্রজননেও সক্ষম নয়, তাহলে কি এখানে সম্পুর্ণ দু'টি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে এই কয়েক দশকের মধ্যেই? - ব্যাপারটা আসলেই তাই, বিস্মিত বিজ্ঞানীরা নিজের চোখে দেখলেন প্রকৃতিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ঘটনা। প্রথম তিনটি প্রজাতি থেকে পলিপ্লয়েড সংকরায়নের (poliploid hybridization) ফলে দুটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে। আমরা জানি যে, সাধারণত সন্তানেরা তাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বাবা এবং মার প্রত্যেকের থেকে একটি করে ক্রোমজোম পেয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে একটু গোলমেলে ভাবে। মিউটেশনের ফলে নতুন প্রজাতিগুলোর মধ্যে মা বাবার দুজনের থেকেই এক সেটের বদলে দুই সেট করে ক্রোমজোম এসেছে। এর ফলে এরা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম হলেও মা বাবার প্রজাতির স্যালসিফাই এর সাথে আর প্রজনন করতে পারছে না। তার মানে দাড়াচ্ছে এই যে,

এখানে মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ দুটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে আমাদের চোখের সামনেই। গত কয়েক দশকে জেনেটিক্সের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রজাতিগুলোর ডি.এন.এ-র কোথায় কিভাবে এই মিউটেশনগুলো ঘটেছিলো তার সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আমাদের সামনে(১২)।

আমরা এখন কৃত্রিমভাবে পলিপ্লয়েড সংকরায়ন সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের বাগানে যে সব ডালিয়া, টিউলিপ বা আইরিস ফুলের সমারোহ দেখা যায় তাদের বেশিরভাগ প্রজাতিকেই কিন্তু কোন না কোন সময় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরণের ফসলের উদ্ভিদও তৈরি করা হচ্ছে এ নিয়মে। প্রকৃতিতেও, বিশেষ করে উদ্ভিদের মধ্যে, এই পলিপ্লয়েড সংকরায়নের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়।

এক জেনারেশনেই কি বিবর্তন সম্ভব?

বিজ্ঞানীরা তো আজকে সেটাই বলছেন - বলছেন, প্রাণীর বিবর্তনের পদ্ধতিকে খুব জটিল এবং দীর্ঘ মেয়াদী হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন সময় এক জেনারেশনে কিংবা শুধুমাত্র একটি জীনের পরিবর্তনের ফলেই বিবর্তন ঘটে যাওয়া সম্ভব, এবং তারা তা ইতোমধ্যে প্রকৃতিতে এবং ল্যাবরেটরিতে প্রমাণও করে ছেড়েছেন। স্টিকেলব্যক (sticlebacks) বলে এক ধরণের মাছ আছে, এদের বিভিন্ন প্রজাতিকে সমুদ্রের লোনা পানি এবং নদীর মিঠা পানিতেও সমানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র হাজার দশেক আগে, সর্বশেষ বরফ যুগের শেষে, যখন পানির উচ্চতা বেড়েগিয়েছিলো তখনই তাদের একটা অংশ সমুদ্র থেকে নদীতে গিয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে নদীর পানির নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে যায়। সমুদ্রের মাছগুলোর গায়ে ৩৫টি বাড়তি প্লেটের মত হাডডি বা কাঁটার স্তর দেখা যায়, যা দিয়ে তারা নিজেদেরকে ভয়ঙ্কর সব সামুদ্রিক শিকারী প্রাণীর দাঁতালো আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু নদীতে বাস করা স্টিকেলব্যকের প্রজাতিগুলোর জন্যে তো আর নিজের দেহে এত ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র বয়ে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তারা বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়ই অভিযোজিত হয়ে এই অপ্রয়োজনীয় স্তরটা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বের

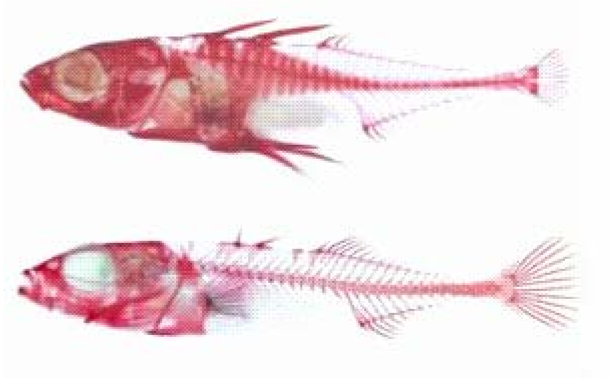

সামুদ্রিক(উপরে) এবং নদীর (নীচে)স্টিকেলব্যকের গঠন
সৌজন্যঃ http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325224057.htm

করেছেন যে, এই বিবর্তনের পিছনে কাজ করছে *Pitx1 gene* নামে একটি মাত্র জীন। গত বছর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, সমুদ্র থেকে নদীর পানিতে মাছগুলোকে স্থানান্তরিত করা হলে তারা নাকি এক জেনারেশনেই এই বিবর্তনটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে, এই বাড়তি স্তরটি আর থাকে না তাদের পরের প্রজন্মে। শুধু তাই নয়, আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটির জেনেটিসিস্ট ডঃ কিংসলির দলটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তা হাতে নাতে পরীক্ষা করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা এই বিশেষ জীনটিকে সমুদ্রের মাছের কোষ থেকে আলাদা করে নদীর মাছের ডিমের মধ্যে ইঞ্জেকশেন দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই ডিম থেকে বের হওয়া মাছের পোনার মধ্যে ঠিকই বাড়তি কাঁটার স্তরটা জন্ম লাভ করেছে যা তাদের পূর্ব প্রজন্মে ছিলো না।

> বিজ্ঞানীরা একটু অবাকই হয়েছেন প্রকৃতিতে বিবর্তনের এত সহজ এবং দ্রুত একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরে, এত বড় একটা পরিবর্তনের জন্য যে মাত্র একটা জীনই দায়ী হতে পারে তাও তারা আশা করেননি। তারা এখন বলছেন যে, প্রকৃতিতে হয়তো খুব খুব সরল উপায়েও বিবর্তন ঘটে এবং তা খুব সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব (১৬)

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানের দু'পাড়ের কাঁঠবিড়ালীগুলো কিভাবে বদলে গেলো?

আমেরিকার গ্রান্ড ক্যানিয়ানেও দু ধারে খুব কাছাকাছি দেখতে দু'প্রজাতির কাঠ বিড়ালী বা স্কুইরেল দেখা যায়। তারা দেখতে শুনতে ব্যবহারে প্রায় এক রকম হলেও একে অপরের সাথে প্রজননে অক্ষম। এই প্রকান্ড এবং দুর্ভেদ্য গিরিখাতের দক্ষিণ দিকের কালো পেট আর সাদা লেজ সহ প্রজাতিটির নাম হচ্ছে *কাইবাব* কাঠবিড়ালী আর উত্তর দিকের সাদা রং এর পেট এবং ধুসর রং এর লেজ সহ প্রজাতিটার নাম হচ্ছে *অ্যাবার্ট* কাঠবিড়ালী। সর্বশেষ বরফ যুগে গ্রান্ড ক্যানিয়ানের পরিবেশ এবং গাছগাছালিতে বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। এর আগে কিন্তু তারা একই প্রজাতিই ছিলো এবং এক ধরনের বিশেষ পাইন গাছের কান্ড খেয়েই এরা বেচে থাকে। কিন্তু বরফযুগে গিরিখাতের মাঝখানের সমস্ত পাইন গাছ ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তারা হয়ে পড়ে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। আর তার ফলশ্রুতিতেই

প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাদের বিবর্তন ঘটতে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন নিয়মে। দীর্ঘ দিন ধরে স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তনের ফলে তারা আজকে সম্পুর্ন দু'টি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এরকমই একটা উদাহরণ দেখেছিলাম গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে ডারউইনের দেখা বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চদের মধ্যে। প্রায় ৫ লাখ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক ধরণের ফিঞ্চ পাখি থেকে এখন গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে ১৪ ধরণের স্বতন্ত্র প্রজাতির ফিঞ্চের জন্ম হয়েছে।

টিকটিকিগুলো এরকম রিং এর মত করে তাদের বাসা সাজালো কেনো?

আরও মজার মজার কিছু উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। রিং বা চক্রাকার প্রজাতির উদাহরণটির কথা উল্লেখ না করলে বিবর্তনের গল্পটা যেনো অসম্পুর্ণই রয়ে যাবে। আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকুল এলাকা ধরে কয়েক প্রজাতির টিকটিকি (*Ensatina eschscholtzii* group) মিলে

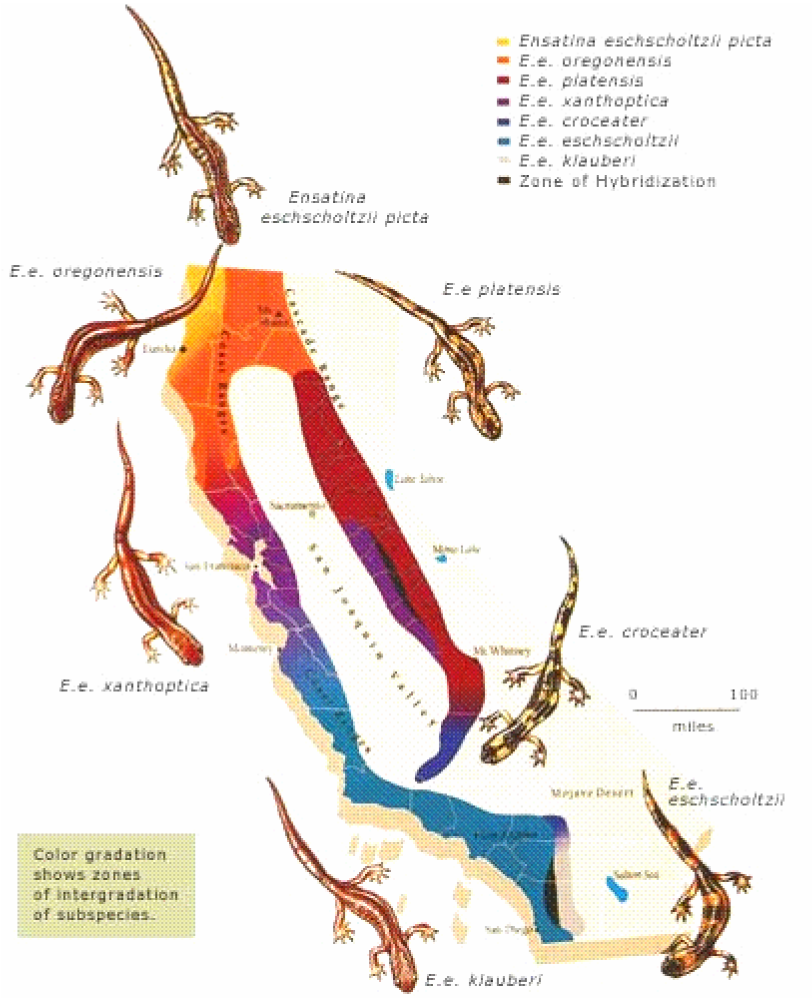

টিকটিকির চক্রাকার প্রজাতি সৃষ্টি (Ring Species of Salamanders in Western USA)
সৌজন্যঃ http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/05/2/images/l_052_05_l.jpg

এধরনের একটা রিং তৈরি করেছে। গত শতাব্দীতে ডঃ রবার্ট স্টেবিনস প্রথম এদেরকে পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন যে, এদের পুর্বপুরুষেরা যখন উত্তর থেকে দুই দিকে ভাগ হয়ে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে থাকে (উপরে ছবিতে দেখুন) তখনই শুরু হয়েছিলো এই রিং তৈরির চক্রাকার খেলা (১৩)। তারপর যতই তারা দ'ুদিকে থেকে দুরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো ততই তাদের মধ্যে ভিন্ন ধারায় বিবর্তন ঘটতে শুরু করলো।

তারপর দীর্ঘদিন পরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া স্যান ডিয়াগোতে এসে যখন তারা আবার মিলিত হলো তখন ইতোমধ্যেই তারা দূটি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আর প্রজনন সম্ভব হচ্ছে না (৫)। অনুজীববিদ্যা এবং ডি.এন.এ সিকোয়েন্সিং এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এখন এদের জীনের বৈশিষ্ট্যগুলোও খুঁজে বের করেছেন (১৪), আর তাদের পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ডঃ স্টেবিনস ঠিকই ধরেছিলেন - ক্রমান্বয়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হতেই এদের মধ্যে এক প্রজাতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির জন্ম হয়েছিলো। আপনি উত্তরে, রিং এর গোড়া থেকে জীনের ধারা পরীক্ষা করতে করতে যতই দু'ধার বেয়ে দক্ষিণে নেমে যেতে থাকবেন ততই দেখবেন ধারাবাহিকভাবে জীনের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাচ্ছে।

> *এধরনের রিং প্রজাতিগুলো বিবর্তনবাদের মূল বক্তব্যকে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে তুলে ধরে –একদিকে তারা যেমন ক্রমান্বয়ে ঘটা বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলোকে স্পষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত করে, আবার অন্যদিকে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে কিভাবে ধীরে ধীরে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তারও সাক্ষ্য বহন করে।*

এ ধরণের পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিতে একই রকমের ফলাফল পাওয়া গেছে। ডড (Dodd, 1989), রাইস এবং হসটারট (Rice & Hostert, 1993) সহ আরও অনেক বিজ্ঞানীই ফ্রুট ফ্লাই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, কিছু ফ্রুট ফ্লাইকে প্রজননগতভাবে আলাদা করে ফেলে ভিন্ন পরিবেশে বড় করলে, বেশ কিছু জেনারেশন পরে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তৈরি হতে দেখা যায়। নতুন পরিবেশের সাথে ক্রমাগতভাবে অভিযোজিত হতে হতে এক সময় তারা এতই বদলে যায় যে, আর একে অপরের সাথে প্রজনন করে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, পরিণত হয় এক নতুন প্রজাতিতে (১৫)। এরকম ধরণের বহু পরীক্ষাই করা হয়েছে গবেষণাগারে গত এক শো বছরে, তাদের ফলাফলগুলোও আমাদের হাতের কাছেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আজকের দিনে বাজারে গিয়ে ট্যাকের পয়সা খরচ করে বই কিনে তো আর এগুলো তথ্য খুজে বের করার প্রয়োজন হয় না, যে কেউ ইচ্ছে মাফিক Google এ একটা সার্চ দিয়েই পেয়ে যেতে পারেন এধরণের উদাহরণ বা পরীক্ষার শ'য়ে শ'য়ে রিপোর্ট।

সহ-বিবর্তনের এক মজার উদাহরণঃ

বিজ্ঞানের চোখে একটা সুদৃঢ় তত্ত্বের বৈশিষ্টই হচ্ছে এর সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎবানী করার ক্ষমতা। মানে, আপনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তা দিয়ে আপনি ভবিষ্যতের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারবেন, যা হয়তো এখন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইন

যখন সর্বপ্রথম আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্বটি (General Theory of Relativity) প্রকাশ করলেন, তখন সেতত্ত্বের মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে ছিলো মহাবিশ্বের প্রসারণের সম্ভাবনা, কিংবা ব্ল্যাক হোল নামের রহস্যময় বস্তুর অস্তিত্বের আলামত যা থেকে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না। এগুলো সবগুলোই পরবর্তীতে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই আইনস্টাইনের তত্ত্বটি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্থক একটি তত্ত্ব। আর ঠিক একইভাবে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অকল্পনীয় সার্থকতা - আজ থেকে দেড়শো বছর আগে সীমিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এমনই এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যার সঠিকতা ও যৌক্তিকতা যে বারবার প্রমানিত হয়েছে তাই শুধু নয়, এমনকি এ প্রসঙ্গে তার দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প এবং ভবিষৎবানীগুলোও মিলে গেছে! মজার একটা কাহিনী শোনা যাক তাহলে এবার। ডারউইন লন্ডনের এক গ্রীন হাউসে মাদাগাস্কারের বিশেষ একটা অর্কিড দেখেন যার মধু রাখার পুষ্পাধারটি ১১ ইঞ্চি লম্বা (নীচের ছবিতে দেখুন)। তিনি তা দেখে মন্তব্য করেন যে, মাদাগাস্কারের যে জায়গায় এই অর্কিডটা দেখা যায়, সেখানে এমন এক ধরনের মথ জাতীয় কোন পোকা থাকতেই হবে যাদের সুর বা হুল হবে একই রকমের লম্বা। কারণ এই লম্বা মধুর পুষ্পাধারের ভিতর শুর ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার সময়ই মথগুলো অর্কিডটার পরগায়ন ঘটাবে। এবং তাইই হলো - কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা ঠিকই খুঁজে পেলেন সেই মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ *Xanthopan morganii praedicta*। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকার সংগ্রামে

মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ *Xanthopan morganii praedicta*

এবং অর্কিড *Angraecum Sesquipedale*

(National Geographic এর সৌজন্যে)

টিকে থাকার জন্য অনেক প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যেই এ ধরণের সহযোগীতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়, এবং তার প্রয়োজনেই তারা দুজনেই অভিযোজিত হতে থাকে। আর একেই বলে সহ-বিবর্তন (co-evolution)। প্রকৃতিতে এমন কোন জীব নেই যে শুধু নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রজাতির সেবা করার জন্য বেঁচে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। ডারউইন তার *Origin Of Species* বইতে তার পাঠকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ ধরণের একটা প্রজাতি খুঁজে বের করার জন্য, এবং আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারেনি (১০)।

শেষের কিছু কথা

এ ধরণের উদাহরণের কিন্তু কোন শেষ নেই, বিজ্ঞানীরা গত একশো দেড়শো বছরে যে পরিমাণ গবেষণা করেছেন বিবর্তন নিয়ে তা এক কথায় 'অচিন্তনীয়', কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখবো তা ঠিক করাই যেনো একটা কঠিন কাজ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিল, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শারীরিক এবং জেনেটিক সাদৃশ্য, বিলুপ্তপ্রায় অংগগুলোসহ বিবর্তনবাদের পক্ষে পাওয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখন পর্যন্ত যত ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে তার সবগুলোই একবাক্যে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। ফসিলবিদ এবং জীববিজ্ঞানীরা যখন প্রথমবারের মত বলেছিলেন যে ডলফিন এবং তিমি মাছ এক সময় বিবর্তিত হয়ে ডাঙ্গার প্রাণী থেকে জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তা 'অসম্ভব' ভেবে নিয়ে বিবর্তনবাদ-বিরোধীরা মহা হইচই শুরু করে দিয়েছিলেন। অথচ আজকে ফসিলবিদরা এমন কিছু ফসিল খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে তিমি বা ডলফিনের বিবর্তনের একটি বা দু'টি মধ্যবর্তী স্তর নয় বরং পাঁচ পাচটি স্তরকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। বিবর্তনবাদের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ, এবং এ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো ফসিল নিয়ে লেখা পরবর্তী এক অধ্যায়ে।

> বিজ্ঞানীরা মাটির ভিন্ন স্তরে পাওয়া লাখ লাখ ফসিলের মধ্যে এমন একটি ফসিলও এখনও খুঁজে পাননি যা কিনা জীবের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করে না। এরকম একটা ফসিলও যদি বের হয় এবং বিবর্তনবাদ দিয়ে যদি তার ব্যাখ্যা না দেওয়া যায় তাহলেই বিবর্তনবাদের তৈরি বিজ্ঞানের এই শক্ত ইমারতটি শুড়মুড় করে ভেঙ্গে পরতে পারে। একবার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জে বি হ্যালডেন কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো কি দিয়ে বিবর্তনকে ভুল বলে প্রমান করা যাবে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন যদি কেউ প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে একটা খরগোশের ফসিল খুঁজে বের করে দিতে পারে তাহলেই হবে। সব ভালো তত্ত্বের মতই বিবর্তনবাদও ভুল বলে প্রমানিত হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা তো ঘটেইনি , বরং এর উলটোটাই ঘটে চলেছে আজকে দেরশো বছর ধরে।

গত কয়েক দশক ধরে অনুজীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের কল্যাণে বিবর্তনের পক্ষে আরও সুক্ষ্ম এবং নিখুঁত সব প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর কিছু উদাহরণ আমরা উপরেও দেখেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মেনডেল কতৃক জীনের আবিষ্কার আর ষাটের দশকে ডি এন এর আবিষ্কার যেনো বিবর্তনবিদ্যার জন্য জীয়ণকাঠি হিসেবে কাজ করেছিলো। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার তার ২০০১ সালে প্রকাশিত *What Evolution Is* বইতে বলেছিলেন, অনুজীববিজ্ঞান যখন আবিস্কার করলো যে, জীবের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুগুলোও (জীন, প্রোটিন ইত্যাদি) তার দেহের বিবর্তনের সাথে সাথে একইভাবে বিবর্তিত হয় সটি ছিলো আমাদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিতরকম সুখের খবর। আমরা এখন আমাদের জীনের মধ্য থেকেই খুঁজে পেতে পারি বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের অলিখিত ইতিহাস। Richard Dawkins তার ২০০৪ সালে প্রকাশিত Ancestor's Tale বইতে বলেছিলেন ,

’The DNA information in all living creatures has been handed down from remote ancestors with prodigious fidelity. The individual atoms in DNA are turning over continually, but the information they encode in the pattern of their arrangement is copied for millions, sometimes hundreds of millions, of years. We can read this record directly, using the arts of modern molecular biology to spell put the actual DNA letter sequences or, slightly more indirectly, the amino acid sequences of protein into which they are translated.' (19)

বিজ্ঞানীরা এখন এধরণের বিভিন্ন ধরণের গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন, ২০০৩ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে প্রথমবারের মত মানুষের জীনের সিকোয়েন্সিং করে শেষ করেছেন। হিউমান জিনোম প্রজেকটের ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, আমাদের জিনোম (জীবের পুর্নাঙ্গ জেনেটিক তথ্য) আসলে একটি বইয়ের মত যাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। একদিকে একে ইতিহাসের বই হিসেবে ব্যবহার করা যায় যেখানে আমাদের প্রজাতির বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে এ হচ্ছে কোষ তৈরির একটি ব্লু প্রিন্ট যা অবিশ্বাস্যরকমের বিস্তারিত নির্দেশাবলী দিয়ে পরিপূর্ণ। আর চিকিৎসা জগতের জন্য এটি হচ্ছে এমনি একটি পাঠ্যবই যা কিনা বিভিন্ন ধরণের রোগ ঠেকানো এবং চিকিৎসার জন্য নতুন এক মহাশক্তি হিসেবে কাজ করবে (২১)। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ইঁদুর, কুকুর, গরু, ফ্রুট ফ্লাই সহ বিভিন্ন প্রাণীর জীনের সিকোয়েন্সিং করেছেন বা করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

যে প্রাণী বিবর্তনের ঘড়ির হিসেব অনুযায়ী যত কাছাকাছি সম্পর্কিত ততই তাদের জেনেটিক গঠনও একই রকমের। আমাদের নিজেদের কথাই ধরা যাক, এতক্ষণ তো আমাদের চারপাশের গাছপালা, জীব জন্তুর বিবর্তনের গল্প শুনলাম, নিজেদের প্রজাতির কথাটা বলে লেখাটা শেষ না করলে হয়তো খামতি থেকে যাবে। আমরা মাত্র ৫-৮ মিলিয়ন বছর আগে এক ধরণের শিম্পাঞ্জী থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ নামের এই প্রজাতিতে পরিণত হয়েছিলাম। উনিশ শতাব্দীতে ডারউইন এবং টি এইচ হাক্সলি যখন প্রথম এই কথাটি বলেছিলেন তখন সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। ধর্মাপ্রাণ মানুষেরা তো বিবর্তনবাদকেই অস্বীকার করেছিলো, আর যারা অন্যান্য জীবের বিবর্তনকে যাওবা সঠিক বলে মনে করেছিলেন তাদের পক্ষেও নিজেকে ওই শিম্পাঞ্জীগুলোর উত্তরসুরী বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাড়িয়েছিলো। এই তো সেদিন - ২০০৫ সালের সেপটেম্বর মাসে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত মানুষ এবং শিম্পাঞ্জীর জিনোমের পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করলেন যে, বিজ্ঞানীরা এত দিন ধরে ঠিকই ধারণা করে আসছিলেন। আসলেই আমাদের সাথে আমাদের এই পুর্বপুরুষের ডি এন এ ৯৮.৭% ই এক - আমরাও আসলেই এক ধরণের উন্নত প্রজাতির বানর ছাড়া আর কিছুই নই(১৮)। আমাদের হিমোগ্লোবিনের সাথে শিম্পাঞ্জীর হিমোগ্লোবিনও প্রায় হুবুহু মিলে যায়।

শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে তাদের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাঁধারও উত্তর পেয়েছেন জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের কল্যাণেই। আমরা বহুদিন ধরেই জানেন যে শিম্পাঞ্জীর কোষে ২৪ জোড়া ক্রোমজোম থাকলেও মানুষের কোষে আছে মাত্র ২৩ জোড়া। মানুষ যদি শিম্পাঞ্জী থেকেই বিবর্তিত হয়ে আসবে তাহলে আরেক জোড়া ক্রোমজোমের হোলটা কি? উধাও তো হয়ে যেতে পারে না হঠাৎ করে, আর সেটা হলে ব্যাপারটা মোটেও কোন ভালো দিকে গড়াতো না। তাই তারা ধারণা করে আসছিলেন যে নিশ্চয়ই বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে মানুষের কোন দু’টো ক্রোমজোম একে অপরের সাথে জোড়া লেগে

গেছে বা মিলে গেছে। আর তা যদি না হয় তাহলে শিম্পাঞ্জী থেকে মানুষের বিবর্তনের এই পুরো ধারণাটাকেই ভুল বলে ধরে নিতে হবে! বিজ্ঞানের বোধ হয় এখানেই মাহাত্ম্যটা, কোন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে একে ভুল দেখানো গেলে তা যত বড় আবিষ্কারই হোক না কেনো তাকে বিনা দ্বিধায় আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিতে কার্পণ্য করেন না বিজ্ঞানীরা। সাইটোজেনিক্স (Cytogenetics) গবেষণা থেকে ঠিকই বের হল যে, আমাদের ২ নম্বর ক্রোমজোমটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এর উত্তর। আমাদের পূর্বপুরষের দু'টি ক্রোমজোম এক হয়ে মিলে গেছে মানুষের এই ক্রোমজোমটির মধ্যে(২০)। বিবর্তনের ধারা বুঝে জীন সিকোয়েনসিং করার মাধ্যমে শুধু যে আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের সম্পর্কে জানতে পারছি তাই নয়, এর ফলে চিকিৎসাবিদ্যার অঙনে এক নীরব বিপ্লব ঘটে চলেছে। যেমন ধরুন না, এই অ্যালজাইমার রোগটির কথাই - একটিমাত্র জীনের (caspase-12 gene) অনুপস্থিতির কারণে স্মৃতিবিভ্রমজনিত যে রোগটি ঘটে, সেই রোগটি কিন্তু আমাদের পূর্বপুরষসহ বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে খুজে পাওয়া ভার। তার অর্থ দাড়াচ্ছে দু'টি, প্রথমতঃ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন একসময় এটা আমরা হারিয়েছি, আর দ্বিতীয়তঃ এই জীনটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অর্থাৎ কোন্ মেকানিজমের সাহায্যে এই রোগ থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে তা খুঁজে বের করতে পারলে হয়তো আমরা এই দুরারোগ্য ব্যাধিটা নিরাময়ের একটা উপায়ও পেয়ে যেতে পারি (২১)।

বিবর্তনের উদাহরণ আমাদের চারপাশে, ছোটটো পৃথিবীটার বুকে এই অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দনের উৎসই হচ্ছে বিবর্তন। একটু চোখ মেলে বাইরের পৃথবীটার দিকে তাকিয়ে দেখলেই আর একে অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজকে আমাদের সারা পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই হয় বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বা জানলেও তাতে বিশ্বাস করেন না অথবা আরেক ডিগ্রি অগ্রসর হয়ে এর বিরুদ্ধে যারপর নাই মিথ্যা প্রচারণা চালান। অথচ সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের জয়জয়কারের পিছনে এর অবদান অপরিসীম। চিকিৎসাবিদ্যা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওষুধ, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল শষ্য তৈরির ক্ষেত্রেই তো শুধু নয়, জীববিজ্ঞানের সবগুলো শাখার মিলনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিবর্তনবিদ্যা। আমাদের চারদিকের প্রাণের বিস্তৃতিকে বিবর্তনের আলোয় বিচার না করলে জীববিজ্ঞানের কোন শাখাই আর পুর্নাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। আজকে পরিবেশ দূষণ বা গ্লোবাল ওয়ারমিং রোধে, গাছপালা, জংগল সংরক্ষণে, মাছ বা গৃহপালিত পশুর বংশবৃদ্ধিতে বিবর্তনবাদের জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। বিবর্তনবাদের চর্চ্চা কিন্তু শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে গেছে সে ওতপ্রোতভাবে। আমাদের নিজেদের ইতিহাসটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য কিংবা ভবিষ্যতে আরও বহুদিন কিভাবে আমাদের প্রজাতিটিকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখা যায় তা জানার জন্য অর্থাৎ আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষৎকে বুঝতে হলে বিবর্তন তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি! আমাদেরকে উত্তর পেতে হবে হাজারো প্রশ্নের- বুঝতে হবে কখন কতগুলো প্রজাতির অস্তিত্ব ছিলো অতীতে, তারা কিভাবে নির্মুল হয়ে গেলো, কেনো ডাইনোসরগুলো হারিয়ে গেলো, কিন্তু টিকে গেলো ওই আরশোলাগুলো। জানতে হবে আমাদের মস্তিষ্কের আকার কখন হঠাৎ করে বড় হতে শুরু করেছিলো, ভাষার উৎপত্তি কখন কি করে হল, এর পিছনে মস্তিষ্কের বিবর্তন কি ভুমিকা পালন করেছিলো, আমাদের এই সভ্যতা সৃষ্টির পিছনে তাদের আবদানই বা কতটুকু? সমাজবিজ্ঞানীরাও আজকে বিবর্তনবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের্ সাথে সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যভার ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে মিলিয়ে দেখতে শুরু করেছেন - আমরা কেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে বা আত্মীয় স্বজনের কথাই ভাবি, কখনও কখনও আবার নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করি, কেনো বিভিন্ন প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, কেনই বা মানুষ ভালোবাসে, প্রেমে পড়ে, সংসারের গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় - এর কতটুকু সামাজিক, সাংস্কৃতিক আব কতটুকুই বা জেনেটিকভাবে আমাদের দেহকোষেই লেখা রয়েছে তাও মিলিয়ে দেখবার সময় হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী

এবং জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে তর্কের কোন সীমা পরিসীমা নেই, বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাবে ততই খোলাসা হয়ে উঠবে এর উত্তরগুলো। বিবর্তনবাদের আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা না বলে আজকের লেখাটা বোধ হয় শেষ করা ঠিক হবে না, আমাদের আধুনিক সভ্যতার চেতনা এবং মননশীলতায় এর ভুমিকা অত্যন্ত গভীর। বিবর্তনবাদ আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে হাজার বছরের ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে - নিজের সৃষ্টি রহস্যের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতবিহ্বল মানব প্রজাতি এক সময় নিজেকে যে আদিম রূপকথা আর অপ্রাকৃত কল্পনার জালে আটকে ফেলেছিলো তা থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে ডারউইনের এই বিবর্তনবাদের তত্ত্বটিই। আশা করা যায় অচিরেই তার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাবে আমাদের এই ক্ষণজন্মা প্রজাতিটির উপর।

Reference:

1) www.actionbioscience.org/evolution/pigliucci/html
Evolution's Importance to society: An Interview with renowned scientist
Massimo Pigliucci. July 2005.
2) Myer, Ernst (2001), What is Evolution, Basic Books, New York, USA. pg 39
3) http://www.unaids.org/epi2005/doc/EPIupdate2005_pdf_en/epi-update2005_en.pdf
4) http://www.thet.orech.org/genetics/news.php?id=13
5) Ridley, Mark (2004), Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, UK.
6) Discover, Special Issue, Volume 27, No-1, January 2006. pg 44
7) http://www.bbc.co.uk/1/hi/health/590915.htm
8) http://www.cnn.com/2005/HEALTH/conditions/12/02/deadly.bacteria.ap/index.html

9) Dr. Berra, M, Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford pg. 52
10) Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA

11) http:// www.plaza.ufl.edu/jtate/ polyploidy/Polyploidy.html

http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9122%28199111%2978%3A11%3C1586%3AOT4YL%3E2.0.CO%3B2-7&size=LARGE

12) http://www.botany.org/ajb/00029122_di001900.php
13) http://www.actionbioscience.org/evolution/irwin.html

14) -Wake, D. B., and K. P. Yanev. 1986. "Geographic variation in allozymes in a 'ring species,' the plethodontid salamander *Ensatina eschscholtzii* of western North America." *Evolution* 40: 702-715.
- Moritz, C., C. J. Schneider, and D. B. Wake. 1992. "Evolutionary relationships within the *Ensatina eschscholtzii* complex confirm the ring species interpretation." *Systematic Biology* 41: 273-291.
- Wake, D. B., and C. J. Schneider. 1998. "Taxonomy of the plethodontid salamander genus *Ensatina*." *Herpetologica* 54: 279-298.

15) Ridley, Mark (2004), Evolution, pg 384; BlackwellPublishing, Oxford, UK

16) - www.the-scientist.com/ 2004/11/08/16/1

- http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20050413/news_1c13fishgene.html

- Discover, Special Issue, Volume 27, No-1, January 2006. pg 62

17) http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/6/text_pop/l_016_06.html
18) SEED, Year In Science 2005, Dec/Jan 2006. pg 92
19) Dawkins, Richard (2004), The Ancestors Tale, The Houghton Mifflin Company, Boston, NY, pg 19.
20) Vol 437|1 September 2005|doi:10.1038/nature04072: ' Initial sequence of the chimpanzeegenome and comparison with the human genome'.
21) http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4197844.stm
22) http://www.genome.gov/12011238

———

লেখক পরিচিতিঃ বন্যা (রাফিদা) আহমেদ বর্তমানে আমেরিকায় পাবলিক হেলথ সেকটরে সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। এর আগে কাজ করেছেন টেলি কমিউনিকেশনস ইন্ডাসট্রিতে, ফাইবার অপটিক্সের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় ৭ বছর। লেখাপড়া করেছেন বায়োটেকনলজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে। ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com